কলকাতা ও আমি

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

গোলমাল - ভরা বাগবাজারের বাসাবাড়ির ছাদে উঠলে, লাল লাল বটফল - ভরা একটা বটগাছ। বটগাছে কাকের বাসা। কাকের বাসায় পাঁচানো লোহার ছাঁট। কাকেরা খড় পোতে না বলে লোহার পাতলা ছাঁট খুজে আনতো। গ্যালিফ ষ্ট্রিটে আমাদের বাড়ির তলাতেই ছিল সার সার লেদ কারখানা।

বটগাছের পাশ দিয়ে কোনাকুনি তাকালে হাওড়া ব্রিজের চুড়ো। যে দিকে সূর্য ওঠে, সে দিকে টালার ট্যাংক। পূর্ব দিকে মুখ করে দাঁড়ালে ডাইন দিকে দক্ষিণ, বাম দিকে উত্তর। পশ্চাতে পশ্চিম। পশ্চিমে গঙ্গা। তো দেখা যায় না, গান শেল ফ্যাক্টরির চিমনি দেখা যায়। কখনো শোনা যেতো জাহাজের ভোঁ। উত্তর দিকে খাল। ঐ খাল নাকি মারাঠা বর্গীদের আক্রমণ থেকে কলকাতাকে রক্ষা করার জন্য সিরাজদৌল্লা কাটিয়েছিলেন। গঙ্গা থেকে ঐ খাল কীভাবে যে বিদ্যাধরীতে মিশেছে। সুন্দরবন যাবার লঞ্চও চলত। আমি দেখেছি। আমি শুনেছি ঐ লঞ্চের ভোঁ আমার বাচ্চা বয়েসে। লঞ্চের ভোঁ শুনিয়ে ঠাকুর্মা বলতেন—ঐ শোন সুন্দরবনের বাঘ ডাকে। আর দক্ষিণ দিকে ছিল বস্তি। টালি আর খোলার ঘর। ওখানেই একঘর কুমোর ছিল। অবাক বিস্ময়ে কুমোরের চাক দেখেছি। হাতের যাদুতে মাটির তাল কীভাবে হাঁড়ি হয়ে যাচ্ছে, ভাঁড় হয়ে যাচ্ছে, গেলাস হয়ে যাচ্ছে দেখেছি। ঐ বস্তিতে জেলেদের ঘরও ছিল। নিজেদের উরুতে সুতালি ঘুরিয়ে সুতোয় পাক দিত, জাল বুনত, কুলো, মোড়া এইসব। ছোট বেলায় আমার আকর্ষণের যায়গা ছিল ঐ বস্তি। সবচেয়ে বেশি সময় কাটত কুমোরের চাকের সামনে। ওরা সম্ভবত বিহারি ছিল। হিন্দি মেশানো বাংলাতে কথা বলত ওরা। ওরাই আমাকে প্রথম লেট্টি খাওয়ায়। ওদের ঘরেই প্রথম যক্ষা রোগি দেখি। যক্ষা রোগির রক্ত। গ্যালিফ ষ্টিটের ট্রাম লাইন পেরুলেই খাল পাড়। ঐ খাল পাড়ে এতটা ঝুপড়ি ছিল না তখন। কিন্তু খুব নোংরা ছিল। বস্তির সবার বিষ্ঠা পরিত্যাগের ক্ষেত্র ছিল ঐ খাল পাড়। সাবধানে বিষ্ঠা এড়িয়ে নেমে যেতাম জলের ধারে। খালের জলে দেখতাম কচুরিপানার গুচ্ছ। দু এক গোছা কচুরিপানা খালধারে পড়ে এসে থেমে থাকলে, হাতে উঠিয়ে ওদের শরীর দেখতাম, স্পঞ্জের মতো ডাঁটি, মোটা মোটা পাতা, জলজ গন্ধ। খাল পাড়ে ব্যাং -ও দেখেছি, সাপ ও সাপের খোসল। প্রজাপতি, ফড়িং এবং কচুগাছ। ইঁট - পিচ - কংক্রিটের ঐ শহরে খালধারই আমার প্রথম প্রকৃতি পাঠ। ভাটার জল আর জোয়ারের জলের আলাদা রং। ভাঁটার কালো জলে ভেসে যাওয়া মৃত গরুর পচা গন্ধ। এবং তার উপরে বসা শকুনের জল বিহার। খালপাড়ের কিছুটা অংশে বেড়া দিয়ে রামযতন নামে একজন বিহার থেকে আসা শ্রমিক একটা বাগান করেছিলেন। আমরা বলতাম রামযতনের বাগান। ওখানে কলাবতী ফুল গাছের ঝোপ ছিল। লাল আর হলুদের উপর লাল সাদার ছিট বসানো। ওখানেই দেখি শেফালি ফুল, আর সকাল বেলায় ফুলেদের উপুড় হয়ে পড়ে থাকা। ওরা যেন কমলা সুন্দরী - বিমলা সুন্দরী।

আমার বিধবা ঠাকুর্মা দিদিমারা। রামযতনের বাগানেই দেখি মৌচাক, বুলবুলি পাখি, ফিঙে, পেপে গাছের কষ, কলাগাছের মোচা। ঝড়ে পড়ে যাওয়া পাখির বাসার ফাটা ডিম। ঐ একফালি রামযতনের বাগানেই দেখেছি তেলাকুচো লতার লাল ফল, কচুগাছের হলুদ ফুল, কেঁচো, কেন্নো, মাছরাঙা পাখি। রামযতনের বাগান নিয়ে একটা গল্প লিখেছিলাম। ওখানে আমার স্বভাব দোষে বাগানের ভিতরকার প্রকৃতিমহিমাকে খুব একটা পাত্তা না দিয়ে অন্য একটা গল্প লিখেছিলাম, যেখানে নকশালি সময়ে এক সুটকেস বই গর্ত্ত খুঁড়ে লুকিয়ে ফেলা হয়েছিল রামযতনের বাগানে। তার মধ্যে ছিল মাও-মার্ক্স্-সুভাষচন্দ্র - বিবেকানন্দের বই। ঐ বাগানের কথা লিখেছিলাম চতুষ্পাঠীতেও। বিলুর টাকুর্মা খালপাড়ে কচুর - লতি খুঁজতে গিয়ে সর্পদংশনে মারা যায়। এবছর শারদ 'আমার সময়' পত্রিকায়—'পরবাস' উপন্যাসেও অনেকবার এসেছে ঐ খালধারের কথা। ছোটবেলায় লেখা 'শকুন' গল্পেও আছে ঐ খাল। আর কত লেখায় কতভাবে আছে এ মুহূর্তে মনেও পড়ছে না।

সাত ভাড়াটের বাসা বাড়ি, যার একতলায় ছিল একটা ফালির কল। সেই বাড়িতে থাকতাম ছোটবেলা। ক্লাস ইলেভেনে আমি বিরাটি চলে যাই। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বিরাটিতে। বাল্য ও কৈশোর কেটেছে বাগবাজারে। সেই বাগবাজারে আমাকে মা ক্যাঙারুর মতো পেটের থলিতে পুরে রেখেছে সন্তানের মতো। তবু আমার লেখায় কলকাতার খুঁটিনাটি আসেনি তেমনভাবে।

কলকাতার পাগল, মস্তান, বেশ্যা, ড্রেন, গাঁজার ঠেক, শ্মশান, বাবু-কালচারের তলানি মানুষেরা, যাদের গিলে করা নোংরা পাঞ্জাবিতে দেখতাম সন্ধের রোয়াকে, ম্যাটিনি শোয়ের গিন্নিরা, ছাদ ও ঝুলবারান্দার প্রেম- এরকম কত কিছুই আমার লেখায় তেমনভাবে আসেনি। কেন আসেনি, তার একটা কৈফিয়ৎ দেয়া যেতে পারে।

আজকের যে শিশুটি টেলিভিশন - কম্পিউটার - মেট্রোরেল দেখছে জন্ম থেকেই, এসব দেখে তার চোখে বিস্ময় নেই। যে বিস্ময়ের অনুভব আমাদের ছিল প্রথম দেখা টেলিভিশনে। যে বিস্ময় অপু - দুর্গার শরীর জুড়ে ছিল প্রথম দেখা রেলগাড়িতে। কলকাতার অলিগলি - কুমোরটুলি - কলের জলের লাইনে গালাগালি - এসব কিছু ছোটবেলা থেকেই দেখেছি। ঐ সব গায়ে মিশে গিয়েছিল গায়ে জন্মদাগের মতো। ওসবে আশ্চর্য হইনি। সত্যিকারের আশ্চর্য হয়েছিলাম কর্মসূত্রে গ্রামে গিয়ে। জমি - মানুষের সম্পর্ক, জোতদার, আদিবাসীদের জীবন, ধানগাছের দুধ, সূর্যের রং গিলে সবুজ ধানের হলুদ হয়ে ওঠা, নবান্ন, মাঠের ইঁদুর, ইঁদুরের গর্ত থেকে ধান খোঁজা বালক বালিকা, হাঁড়িয়া, মুনিষ - মাহিন্দার ইত্যাদি দাসখত লেখা মানুষ, এসব আমাকে আরও বেশি আশ্চর্য করল। ঐ সব রহস্য আপ্লুত করল। তাই আমার ২৩/২৪ বছর বয়সে যখন গল্প লেখা শুরু করলাম-তখন গ্রাম নিয়েই লিখলাম। রামযতনের

বাগান এবং খালধার আমাকে প্রকৃতিপাঠের অ-আ-ক-খ দিয়েছিল, কিন্তু কানুনগোর চাকরি আমাকে ঐ বর্ণগুলি দিয়ে বাক্যগঠন শেখাল। আমি বেশ কিছুদিন গ্রামে মজে গেলাম।

'ভূমিসূত্র' এবং 'অষ্টচরণ ষোল হাঁটু'র বেশিরভাগ লেখাগুলোতে কলকাতা নেই। যদিও জীবনের প্রথম দিকের গল্পগুলো কলকাতা নিয়েই। সেইসব গল্পগুলি কোনও সংকলনেই অন্তর্ভুক্ত করিনি। জানি না খুঁজলে ফিরে পাব কিনা। প্রথমে কবিতাই লিখতাম। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝে যাই ওগুলো কবিতা হচ্ছে না। কলেজ ম্যাগাজিনে যে গল্পটি লিখলাম সেখানে এক রাজমিস্ত্রির দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ব্যাপার ছিল। যেখানে মুখ থুবড়ে পড়েছিল সে, সেখানেই গৃহপ্রবেশের আলপনা আঁকা হয়, মঙ্গল ঘট বসে। এরকম। যখন থার্ড ইয়ারে, তখন 'অমৃত' পত্রিকায় 'বাঁধানো দাঁত' নামে একটা গল্প দিয়ে আসি, ছাপা হয়, টাকাও পাই। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আগে অমৃত -তে আসেনি। মনীন্দ্র রায় ছিলেন সম্পাদক। গল্পটা ছিল একটা ছোট কারখানার শ্রমিক - কে নিয়ে। সেই শ্রমিক তাঁর বালকপুত্র -কে নিয়ে বিশ্বকর্মা পুজোয় খেতে গেছে। বালকপুত্রের চোখে দেখা বাবুবাড়ি। তার অপমান বোধ। পরের গল্পটাও কলকাতা নিয়ে 'চতুরঙ্গে' ছাপা হয়। কলকাতার মিষ্টির দোকানের সন্দেশের কারিগর, যারা মোটাসোটা হয়, এবং সেই দোকানের বালক 'বয়' -এর গল্প। পরের দুটি মধ্যাহ্ন -তে ছাপা হয়। সেই দুটি কলকাতার গল্প। এইসব কোনও গল্পই কোনও সংকলনে নেই, আগেই বলেছি। আমার প্রথম ঠিকঠাক গল্প- 'রত্নাকরের পাপের ভাগ'। মধ্যাহ্নতে ছাপা হয়। ওটা লেখা হয় সম্ভবত ১৯৭৫ সালে। আমার বয়েস তখন তেইশ। কানুনগোর কাজ করছিলাম মাত্র দেড় বছর। নানা কারণে চাকরিটা ছেড়ে দিতে হ'ল। আমি কাজ নিলাম হাওয়া অফিসে। প্রথমে আলিপুর, পরে দমদম বিমানবন্দর। কিন্তু গ্রাম আমাকে ছাড়লো না। প্রমা অনুষ্টুপ বা অন্যান্য পত্রপত্রিকার অধিকাংশ লেখাতেই গ্রামের মানুষ এল। হাওয়া অফিসের কাজে বদলি হয়ে পানাগড়ে যেতে হয় ১৯৭৮ সালে। ওখানে আবার গ্রামের মানুষ। একা একা হেঁটে বেড়িয়েছি বনকাটি, শ্রীমন্তপুর, আঁসুড়ে এসব গ্রাম। মনসার ভর দেখেছি, বাদুড় শিকার, গ্রাম্য যাত্রাদল, গ্রামের উঠতি বড়লোক যারা 'উন্নয়নের' সঙ্গে জড়িয়ে ব্যবসাপাতি করছে, দেখেছি ওদের টাকা ওড়াবার নতুন নতুন কায়দা। এসব নিয়েই আমার লিখতে ইচ্ছে করছে। শুধু আমি কেন, অভিজিত সেন, অমর, ভগীরথদা, সাধনদা, ঝড়েশ্বর, সুব্রত, শচীন, কিন্নর, নলিনী, সৈকত, আফসার, অনিল, রামকুমার সবাই মোটামুটি ভাবে এরকমই লিখেছে। আবুল বাশার, নলিনী, ভাগীরথ, আফসার, সৈকত, অনিল এরা অবশ্য গ্রামেই বড় হয়েছে। কিন্তু অমর কিন্নর এরা শহরেই ছোটবেলাটা কাটিয়েছে। কিন্তু গ্রামের কথাই লিখেছে বেশি। বিশেষত– নবারুণ ভট্টাচার্য, দেবর্ষি সারগী, রবিশংকর বল। ওরা একটু অন্যপথে হেঁটেছেন। সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় গৌর বৈরাগী শতদ্রু মজুমদার মফস্সল এঁকেছেন নিপুন ভাবে। সাধনদাও। জয়ন্ত, অরিন্দম, সুকান্ত এঁদের লেখা কলকাতা- কেন্দ্রিক হলেও এরা প্রায়ই কলকাতার বাইরে চলে যান ওদের লেখায়। মুর্শেদ, আনসারুদ্দিন, সুরঞ্জন- এঁরা কলকাতা থেকে দূরে বড় হয়েছেন। কলকাতা এঁদের লেখায় সেঁটে নেই। দূর থেকে দেখা কলকাতা এঁদের লেখায় আছে। অসীম ত্রিবেদী, অলোক গোস্বামী, উল্লাস, মানব চক্রবর্তীরাও দূরে থেকে কলকাতাকে কেন্দ্র করে মাঝে মধ্যে ভালোই লিখেছেন। শভংকর, বাসব, অমিত ভট্টাচার্য এরা মূলত নাগরিক। অমিতাভ সমাজপতির লেখায় কলকাতার নির্যাস পাওয়া যায়। লেখকের নাম করে লাভ নেই। অনেকেই বাদ থেকে যান। আমি প্রবণতা বোঝাতে চাইছিলাম।

কলকাতাকে যারা একসময় দূর থেকে দেখেছেন– তাঁদের অনেকেই কলকাতার কথকতা করেছেন সার্থক ভাবেই। যেমন বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, সমরেশ, জ্যোতিরিন্দ্র প্রমুখ। এঁরা যখন কলকাতা এলেন, কলকাতা ওদের রহস্য বিছিয়ে দিল, অবাক করল। সেই অবাক হওয়া থেকেই ওদের লেখা। আমাদের উল্টো ব্যাপারটাই ঘটেছিল ওদের ক্ষেত্রে। মতি নন্দী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় কলকাতায় শৈশব ও যৌবন কাটিয়েছেন। সুনীলও। শ্যামলও কিছুটা। এদের সবার লেখাতেই কলকাতা জীবন্ত। তবে শ্যামল অনায়াস দক্ষতায় বারবার কলকাতার বাইরে বিচরণ করেছেন।

আমার প্রথম উপন্যাস 'চতুষ্পাঠী' ১৯৯২ সালে লেখা। আমার বয়েস তখন চল্লিশ। এক রিফিউজি পন্ডিত পরিবার কলকাতার বাসা বাড়িতে থাকেন। ওখানেই তাঁর টোল। তাঁর বিচরণক্ষেত্র উত্তর কলকাতা। ঐ উপন্যাসে শোভাবাজার - আহেরিটোলা- হাতিবাগান এসব অঞ্চল উঠে এসেছে ঠিকই, কলকাতার জীবনসংগ্রাম, ভাড়াটে বাড়ি, গলি, রোয়াক, তাস - ইত্যাদি আছে হয়তো, কিন্তু 'চতুষ্পাঠী" কলকাতার উপন্যাস নয়। কলকাতার উপন্যাস বরং কিছুটা 'অবন্তীনগর'। কলকাতায় ব্যবসা করতে আসা সুবর্ণবণিক সমাজের একটি পরিবারকে নিয়ে ঐ আখ্যান। ঐ উপন্যাসেও উত্তর কলকাতার অলিগলি, ছোট কারখানা, অলস মানুষ, লম্পট, পাগল, বেশ্যা, খাওয়াদাওয়া এসব আছে। কিন্তু কলকাতার অন্তরাত্মা নেই।

সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী আমাকে একবার বলেছিলেন 'অবন্তীনগর' উপন্যাসে অনেক সূক্ষ্ম কাজ আছে ঠিকই, কিন্তু ওটা সুবর্ণ বণিকদের ইতিহাস - কেন্দ্রিক উপন্যাস নয়। সুবর্ণ বণিকদের কথা দিয়ে উপন্যাস শুরু হলেও পরে প্রতিটি চরিত্র সুবর্ণবণিক - সম্পর্কহীন হয়ে পড়েছে। আর ওটার পটভূমি কলকাতা না হয়ে বর্দ্ধমান বা চুঁচুড়া হতে পারত।

সুমিতা চক্রবর্তীর সঙ্গে আমি অনেকটাই একমত।

মতি নন্দী কলকাতাকে মাইক্রোস্কোপে দেখেছেন। তাঁর গল্পে কলকাতার গলির রেন পাইপগুলো নিচের একফুট ভাঙা। যেটা অব্যক্ত, তা হল গলির ফুটবল বা ক্রিকেট খেলা, যা পাইপটার তলা ভেঙে দিয়েছে। মতি নন্দীর কলকাতা অস্তিমজ্জাচর্বিসহ উঠে আসে। শিবরাম চক্রবর্তীও কলকাতাকে দেখিয়েছেন একটু অন্য দৃষ্টিতে। সন্দীপনের কলকাতা দেখার চোখ আলাদা, বুদ্ধদেব গুহহ দেখিয়েছেন কলকাতার উচ্চবিত্ত সমাজ। শংকরও। আমি ঐসব লেখা কিছু কিছু পড়েছি। কিন্তু নিজে কলকাতায় লিপ্ত থেকেও কলকাতাকে গাঢ় আলিঙ্গনেও বাঁধতে পারিনি বলেই মনে হয়।

আমার উপন্যাস কম্পিউটার গেম্‌স্‌ -এর পটভূমিও কলকাতার উদীয়মান ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাট মানে একটু অন্য ধরনের বস্তি। যেখানে প্রাইভেসি - প্রাইভেসি ভাব আছে, কিন্তু আসলে নেই। ওখানে পাশাপাশি দুটি ফ্ল্যাটের কিশোর - কিশোরীদের গল্প। ওদের একজনের কম্পিউটার আছে, অন্য একজনের নেই। কম্পিউটার যুগ তখন সবে শুরু হয়েছে কলকাতায়, সল্টলেকে সেক্টর ফাইভ তখনো জন্মায়নি। কম্পিউটার নিয়ে তরুণ প্রজন্মের পাগলামি এবং তাঁর ট্রাজিক পরিণতি নিয়ে ঐ উপন্যাসটি। অমিতাভ দাশগুপ্তর খুব প্রিয় উপন্যাস ছিল ওটা। প্রতিদিন ওর সাপ্তাহিক কলমে ওটা নিয়ে একদিন লিখেছিলেনও অনেকটা। এটা আমার প্রিয় উপন্যাস। যদিও খুব কম আলোচিত। খুব রূঢ় সত্যি কথা বলা হয়েছিল। কলকাতার কিশোর - কিশোরীদের মধ্যে হঠাৎ আসা দমকা বাতাসের কথা ছিল ঐ উপন্যাসে। 'নবম পর্ব' উড়িষ্যা - কেন্দ্রিক উপন্যাস। বাস্তুকথা মফস্‌সলের। 'যে জীবন ফড়িঙর' উপন্যাসে কলকাতার জীবন কিছুটা ধরা আছে। মহামায়াও কলকাতা - কেন্দ্রিক। 'চলো দুবাই' মফস্‌সলী। এবছরে লেখা পরবাসীতে ১৯৬০/৭০ এর কলকাতা এবং বর্তমানের কলকাতাকে দেখানো হয়েছে একজন এন আর আই -এর চোখে।

এভাবে ভাবিনি কখনো আগে। গল্পমেলার প্ররোচনাতেই এই পোষ্টমর্টেম। দেখা গেল ছোটগল্পের ক্ষেত্রে আমি কলকাতাকে ততটা আমল না দিলেও উপন্যাসের ক্ষেত্রে দিয়েছি। বেশ কিছু উপন্যাসেই কলকাতা এসেছে নানা ভাবে।

যদি গল্পের কথাই ভাবি, 'রক্ত' গল্পটির কথা বলতে হয়। বউবাজার - কলেজস্ট্রিট অঞ্চল যার পটভূমি। ব্লাড ব্যাংক, মেডিকাল, পুঁটিরামের দোকান, ছানাপট্টি, ঠোঙা তৈরি, সিনেমার টিকিট ব্ল্যাকার। - এসব আছে গল্পটির সুরে। 'কাননে কুসুমকলি' কলকাতার শিশুশ্রকিদের নিয়ে একটি গল্প। পতাকার কাপড়, ঝড়ে কাক মরে, হুলো, ইচ্ছে কুসুম, সবই কলকাতা - কেন্দ্রিক। রাধাকৃষ্ণে তো ছিপি গোঁজা নব্য যুবা - যুবতী ও চিড়িয়াখানার মাংস চুরি করা প্রেমিকের কথা, 'মানুষ ও বেগুনে' এক বৈজ্ঞানিকের আকুতি শিশির মাখানো বেগুনের জন্য। ধর্ম, ডিপফ্রিজ, ১১ই সেপ্টেম্বর, মানুষরতন, পুণ্যবতী, বহুজাগতিক- এরকম বেশকিছু গল্পেই কলকাতাকে ধরেছি বা ধরার চেষ্টা করা গছে। কিন্তু আমার শ'তিনেক গল্পের মধ্যে শতকরা হিসেবে কত হবে? ছুঁয়ে যাবার চেষ্টা আছে, কখনো কলকাতা নিয়ে ব্যঙ্গার্থ আছে।

একটা কথা আছে দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বোঝা যায় না। কলকাতাকে পেয়েও কলকাতা নিয়ে সেভাবে লেখা হয়ে ওঠেনি আমার কিন্তু কলকাতা হ'ল লেখার খনি। পৃথিবীর বহু বিখ্যাত বিখ্যাত লেখক কলকাতায় আকৃষ্ট হয়েছেন। এ্যালেন গিন্‌সবার্গ, গুন্টার গ্রাস, দামিনিক লোপিয়ের, আরও কত। কলতাতাকে নিয়ে লিখেছেন বা লেখার জন্য কলকাতা এসেছেন।

কলকাতায় যে প্রতি ইঞ্চিতে রহস্য আছে তা বুঝতে পেরেছিলাম জার্মানি গিয়ে। ইন্দো - জার্মানি কালচার এক্‌সচেঞ্জ প্রোগ্রামে কয়েকজন জার্মান লেখক এসেছিলেন ভারতে, কয়েকজন ভারতীয় লেখক গিয়েছেন জার্মানিতে। একটা ওয়েবসাইটে আমাদের অভিজ্ঞতার কথা লিখতে হ'ত। আমি ছিলাম বার্লিন-এ। বার্লিন নিয়ে কি যে লিখি বুঝতে পারছিলাম না। ঝকঝকে রাস্তা, চকচকে বাস নির্দিষ্ট সময়ে বাস আসছে, নিটোল পাতাল রেল ব্যবস্থা, নোংরাবিহীন পথঘাট, সুপরিকল্পিত মিউজিয়াম– এসব তো যে কোন সভ্য দেশেই থাকা উচিত। আমাদের দেশে নেই সেটা ওয়েবসাইটে বলব কেন? এটা কি বলার মানে হয় যে বার্লিনে কেউ রাস্তার প্রাচীরের গায়ে হিসি করে না? কিন্তু ওরা লিখতে পারে কলকাতায় রাজভবনের সামনেও হিসি করে। কলকাতার গলিতে পাঁচিলের গায়ে হিন্দু দেবদেবী, কাবা শরীফ, ক্রস চিহ্ন এস ছবি থাকে সহর্ধমা সংহতির জন্য নয়। সর্বধর্মের পুরুষমানুষেক পাঁচিলে হিসি করা থেকে বিরত রাখার জন্য।

রিসনার নামে যে লেখকটি কলকাতায় ছিলেন, ওয়েবসাইটে তাঁর লেখাই সবচেয়ে ভালো হয়েছিল। কোনোদিন কালীমন্দিরের পাঁঠাবলি, রক্ত, ভক্তদের কপালে রক্তফোঁটা নিয়ে লিখলেন, কোনোদিন কলকাতার রাস্তার যানবাহন নিয়ন্ত্রণ নিয়ে! লিখলেন 'রাস্তার মোড়ে এক ধরনের ভলান্টিয়ার থাকে, ওদের হাতে একটা করে ডান্ডা থাকে, এবং ডান্ডা দিয়ে যানবাহনের গায়ে মারা হয়। ঐ ডান্ডা মারার একটা কোড ল্যাংগুয়েজ আছে। ঐ কোড অনুযায়ী ড্রাইভাররা বাস চালায়।" একদিন লিখল ফুটপাতের খাবার নিয়ে। রাইটার্স বিল্ডিং -এর সামনে সারা পৃথিবীর খাবার পাওয়া যায়। ফ্রুট স্যালাডের মধ্যে মাঝে মাঝেই বালতি থেকে হাতে করে নোংরা জল ঠেটানো হয়, এবং ঐ জল মাখানো ফল খেতে কলকাতার মানুষ আপত্তি করে না। একদিন লিখলেন রাস্তায় মুরগিমাংস বিক্রি নিয়ে। মুরগি ছাড়ায় যে বালকটি, তার সারা হাতে গায়ে রক্ত এবং ঐ রক্তাপ্লুত অবস্থায় সকালের ফুল চন্দন ফোঁটা নিচ্ছে বাহ্মণ পূজারীর কাছ থেকে। একদিন বেশ্যা নিয়ে, একদিন শশ্মান যাত্রীদের হট্টগোল নিয়ে, একদিন লিখলেন কলেজস্ট্রিটের বইপাড়া নিয়ে, একদিন গঙ্গার ঘাটের প্রকাশ্য ম্যাসেজ ক্লিনিক বা দলাইমলাই নিয়ে...। এই সব আমরা দেখি রোজ দেখি। লিখি না।

সেভাবে লেখাই বা হ'ল কই? সব প্রদেশেই শহর আছে, যেখানে সবাই জড়ো হয়। মহারাষ্ট্রে যেমন মুম্বাই, নাগপুর, পুনে, ঔরাঙ্গাবাদ, উত্তরপ্রদেশে এলাহাবাদ ছাড়াও কানপুর, বারাণসী, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, অন্ধ্রে হায়দ্রাবাদ ছাড়াও ভাইজাগ, ...এরকম। পশ্চিমবাংলায় শুধু কলকাতা। শিলিগুড়ির এখনো নিজস্ব গন্ধ - বর্ণ তৈরি হয়নি। কলকাতার, বারাণসীর মুম্বাই, পুনে, মাদুরাই– সবারই আলাদা আলাদা গন্ধ আছে। প্রত্যেকটা শহরকে ঘানিতে চাপালে আলাদা আলাদা তেল বের হবে। কলকাতার তেল আমি বের করতে পারিনি।

কলকাতা দাবী করে ওকে নিয়ে লেখা হোক। কলকাতার প্রতি এটা আমার দায়। সময় বহে যায়। কবে লিখব?